অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। আমাদের গাফ্‌ফার চাচা।।

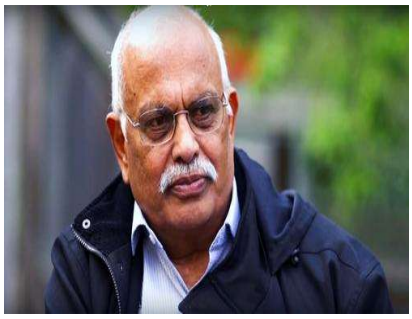

আজ ১৯ মে। আমার প্রিয় লেখক, কলামিষ্ট সুকুমার সৃষ্টির নায়ক শ্রদ্ধাভাজন আবদুল গাফফার চৌধুরী তাঁর যাবতীয় লেখালেখি এবং দায় দায়িত্ব শেষ করে পরপারে চলে গেলেন। লন্ডনের এক হাসপাতালে তিনি তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর সাথে আমার সরাসরি পরিচয় ২০০০ সালে। তবে ষাটের দশকে একুশের প্রভাতফেরী গুলোতে পাকি "ঠোলাদের" লাঠি চার্জ আর টিয়ার শেল খেয়ে যে গানটি (আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী) কান্না জড়িত কন্ঠে গাইতে গাইতে অলিগলিতে ঢুকে পড়তাম - জেনেছিলাম সে অমর গানের রচয়িতা সাংবাদিক কলামিষ্ট আবদুল গাফফার চৌধুরী। বয়স বাড়ার সাথে সাথে আরো গভীরভাবে পরিচিত হতে থাকলাম তাঁর লেখায়। তাঁর লেখা পড়লে মনে হতো - তিনি যেন আমারই কথা বলছেন। সেই থেকেই তিনি আমার প্রিয় লেখক। আমাদের আবদুল গাফফার চৌধুরী।

সময় গড়িয়ে চলে। ছাত্র জীবন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, স্বদেশে চাকরী জীবন এবং অবশেষে প্রবাস জীবন। সর্বদাই সঙ্গী করে রেখেছি - আবদুল গাফফার চৌধুরী। দেশের সংকট গুলোর সময়ে মন খারাপ হয়েছে। আবদুল গাফফার চৌধুরীর লেখা পড়েছি - হতাশাকে জয় করার চেষ্টা করেছি। আবার তাঁর অনেক লেখায় বিস্মিতও হয়েছি। মনে হয়েছে এ লেখা তাঁর নয়। তাঁর নিজের কথা নয়। নিশ্চয়ই তিনি কোন অনুরোধের আসরের সঙ্গীত সঞ্চালক হয়েছেন।

২০০০ সালের কথা। বঙ্গবন্ধু পরিষদ অষ্ট্রেলিয়া আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে আসার জন্য তাঁকে আমন্ত্রন জানালাম। তিনি এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। সিডনি এলেন। বৈবাহিক সূত্রে পারিবারিক দিক থেকে তিনি আমাদের ঘনিষ্ঠজন হলেও সর্বদাই তাঁর বাঁশী শুনেছি - চোখে দেখিনি। স্ত্রী কবিতার কাছে যেমন শুনেছি ওদের চাচা ফয়েজ আহমদের কথা তেমনি শুনেছি গাফফার চাচার কথা। চাচির কথা। তাঁদের স্নেহ আদরের কথা। তো সেবারই প্রথম দেখলাম। সিডনিতে আমাদের আতিথ্যেই ছিলেন। ফলে জীবনের জমে থাকা নানান প্রশ্ন , প্রিয় অপ্রিয় মন্তব্য কিছুই বাদ রাখিনি। তিনিও রেখে ঢেকে কিছু বলেন নি। কত কথা। দেশের কথা। বঙ্গবন্ধুর কথা। মুক্তিযুদ্ধের কথা। তাঁদের দু বন্ধু - তিনি এবং এম আর আখতার মুকুলের কথা। এমনকি তাঁদের ঝগড়া বিবাদ নিয়েও কথা। সব মিলিয়ে মনে হয়েছে তিনি আমার অনেক দিনের

চেনা - অপ্রিয় সত্য যিনি নিঃসংকোচে বলে দেন, এবং সত্য এবং বাস্তব ব্যাখ্যা দিতে যিনি ইতস্তত বোধ করেন না। সে কারণে তিনি কখনো আওয়ামী লীগের - আবার কখনো আওয়ামী লীগের নন। কারণ তিনি আওয়মী লীগার নন তবে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগকে ভালো বাসেন। আর সে কারণে প্রয়োজনে আওয়ামী লীগের সমালোচনাও করেন। আর তখনই আওয়ামী ঘরানার মানুষজন তাঁর উপর বিরক্ত হন।

২০০০ সালে সিডনি এসে তিনি মাতিয়ে গিয়েছিলেন। এটা সত্য তিনি যেমন মোহাবিষ্ট লেখা লেখেন তেমন করে বলেন না তবুও ইতিহাসের মাইল ষ্টোন হয়ে যেভাবে একের পর এক সব বলে গেলেন আমরা সবাই সাতচল্লিশপূর্ব বাংলা থেকে ২০০০ সালের বাংলাদেশ চোখের সমুখে যেন দেখলাম।

২০০৫-এ বঙ্গবন্ধু পরিষদ অষ্ট্রেলিয়া আয়োজিত জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে আমি আবার তাঁকে আমাদের অতিথি করে নিয়ে এলাম সিডনিতে। সঙ্গে বিশেষ অতিথি পারভীন সুলতানা। তবে এবারে একটা শর্ত জুড়ে দিয়েছিলাম। তাঁর সাড়া জাগানো নাটক 'পলাশী থেকে ধানমন্ডি' এখানে মঞ্চস্থ করবো। তিনি বললেন মঞ্চে করার মত যথেষ্ঠ সময় নেই বরং নাটকের সিডি নিয়ে আসবো এবং সিডনিতেই এই সিডির প্রথম প্রকাশনা এই অনুষ্ঠানেই হবে। তাই হলো আমাদের সেই অনুষ্ঠানেই মোড়ক উন্মোচন হলো তাঁর বিখ্যাত নাটক 'পলাশী থেকে ধানমন্ডি'।

এ নাটক নিয়ে যেমন অশ্র " বিসর্জন হয়েছিলো তেমনি প্রতিবাদের ঝড়ও উঠেছিলো। কেউ বলেছেন অতিরঞ্জিত কেউ বা বলেছেন তথ্য সঠিক নয়। নাটক শেষে একজন দর্শক তো আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীকে সে কথা সরাসরি বলেই ফেললেন। আপনার ইতিহাস সত্য নয়। উত্তরে গাফ্ফার চৌধুরী বললেন - ইতিহাস কেউ সৃষ্টি করতে পারে না কিন্তু বিকৃতি করতে পারে। ইতিহাস তার নিজস্ব গতিতে চলে। আমি কেবল সেই ইতিহাসকে সবার সামনে অভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। যদি কেউ মনে করে আমি ভুল ইতিহাস ভুল তথ্য দিয়েছি তাহলে প্রমান করুক কোথায় তথ্য ভুল। আমি আমার নাটকের মূল উপাত্ত নিয়েছি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় এবং মামলার নথিপত্র থেকে যেগুলো সরকারী তদন্তেই বেরিয়ে এসেছে। এ ছাড়া ঘটনা এবং ইতিহাসের পাত্রপাত্রী যাঁরা এখনো বেঁচে আছেন তাঁদের সাথে সরাসরি কথা বলেছি। এ নাটকটি করার জন্য আমি পঁচিশ বছর ধরে পড়াশুনা করেছি। তথ্য সংগ্রহ করেছি। দেশে বিদেশে দেশী বিদেশী লেখক, ইতিহাসবিদ, সাংবাদিক এবং মিডিয়ার মানুষজনের সঙ্গে আলোচনা করেছি। ঘটনার বিশ্লেষণ করেছি। তারপর নাটকে হাত দিয়েছি। আরেকজন তাঁকে প্রশ্ন করলেন - আপনি জিয়াউর রহমানকে এর মধ্যে জড়ালেন কেন? উত্তরে গাফ্ফার চৌধুরী বললেন - জিয়াকে তো আমি জড়াইনি - তিনি নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন ইতিহাসের স্রোতধারায়। তিনিও তো বঙ্গবন্ধু হত্যার ইতিহাসের একজন পাত্র। যেমনিভাবে খন্দকার মোস্তাকও একজন পাত্র। মোস্তাকতো আওয়ামী লীগের লোক এবং বঙ্গবন্ধুর একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী। তাহলে তাকে কি বাদ দিয়ে আমার এ নাটক তৈরী করা উচিত ছিলো? রাম কে বাদ দিয়ে কি রামায়ণ লেখা যায়?

এমন স্পষ্টই তাঁর কথাবার্তা। কেউ পছন্দ করেন কেউ করেন না। এটাই নিয়ম না হলে তো তিনি ফেরেশতা হয়ে যাবেন। তবু যথা সময়ে যথা কথাটি সাহস করে যুক্তি দিয়ে বলার ক্ষমতা সবার মনে থাকলেও প্রকাশের ঝুঁকি নিতে সবাই পারেন না বা চান না যেটা আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী পারেন।

মাসখানেক আগে তাঁর মেয়ে বীনু মারা গেল। এই মেয়েটি তাঁর দেখাশোনা করতো। স্ত্রী বিয়োগ হয়েছেন বছর কয়েক আগে। যদিও নিয়মিতভাবে অসুস্থ হয়ে যেতেন বার্ধকের নানান জটিলতায় তবুও বীনুর অকাল মৃত্যু হয়তোবা তাঁর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে। অসুস্থ হবার আগে তাঁর সাথে টেলিফোনে কথা হয়েছিলো - বললেন শরীরটা ভালো নেই। আর কতদিন বাঁচবো জানি না। শুধু দোয়া কোর আমার জীবনের অন্তিম ইচ্ছা বঙ্গবন্ধুর উপর পূর্ণ দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটা যেন শেষ করে যেতে পারি। বললাম দোয়া অবশ্যই করবো। আপনাকে আরো কিছুকাল বেঁচে থাকতে হবে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা আপনাকে দেখে যেতে হবে। সে লক্ষ্যে আপনার কলম সচল থাকতে হবে।

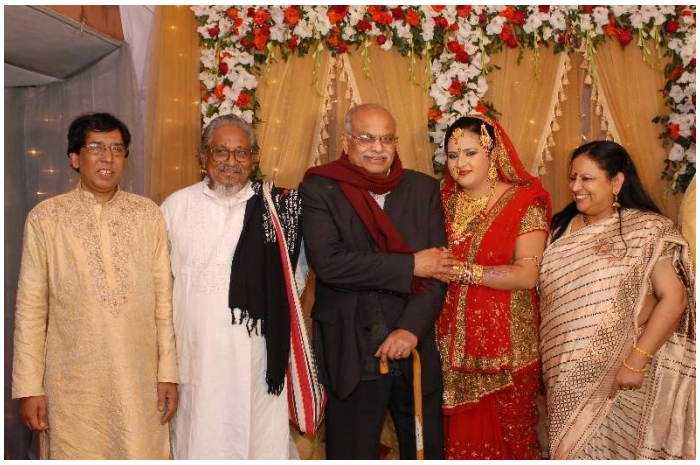

২০১০ সালে মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে দেশে যাবার প্রাক্কালে তাঁকে ফোনে বললাম – চাচা দেশে যাচ্ছি মৌ-র বিয়ে দিতে। দোয়া করবেন। মৌকে তিনি ভীষণ স্নেহ করতেন। বললেন আমারও দেশে যাবার একটা কথা হচ্ছে। যদি যাই তোমার সাথে যোগাযোগ করবো সাগরের মাধ্যমে। ঠিকই তিনি দেশে এলেন তারপর মৌয়ের বিয়েতেও এলেন তাঁর চাচাতো ভাই কবি আসাদ চৌধুরীকে সাথে নিয়ে।

২০১৬-র শেষের দিকে ফোন দিয়ে বললেন আমার মেয়ে বীনু তোমাদের সিডনির বছর শেষের আতশবাজি দেখতে চায়। আমরা আসার প্ল্যান করছি। তোমার ওখানেই থাকবো। বললাম চাচা সেটা তো অবশ্যই কিন্তু আমরা যে দেশে যাবার টিকেট করেছি ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। বললেন তোমরা পরে যাও। টিকেট পেছালাম কিন্তু তাঁদের আর আসা হলো না তাঁর শারীরিক অসুস্থতার জন্য।

২০০৬ এবং ২০০৯ লন্ডনে গিয়েছিলাম কনফারেন্সে – দুবারই তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম। এত আদর করলেন যেন আমি তাঁর নিজের জামাই। চাচী হুইল চেয়ারে বসেই আমার জন্য রান্না করলেন। জীবনের অর্ধকের বেশী সময় এই হুইল চেয়ারেই কাটিয়ে দিলেন। চাচী চলে গেছেন বছর তিনেক হবে। তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে ঢাকায় বুদ্ধিজীবি গোরস্থানে। চাচার শেষ ইচ্ছানুযায়ী তাঁকেও সমাহিত করা হবে চাচীর কবরের পাশে।

আমরা আমাদের একজন অভিভাবক হারালাম। দেশও বোধ করি একজন অভিভাবক হারালো। বায়ান্নর ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু করে একাত্তর এবং এযাবত দেশের জন্য কি করেছেন দেশের মানুষের জন্য কি করেছেন তা দেশের মানুষ জানবে উপলব্ধি করবে। তবে এদেশের জন্য একজন আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী অনিবার্য ছিলো। করুণাময় আপনাকে জান্নাতবাসি করুন।